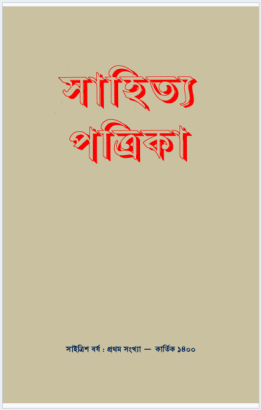

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রন্থ-পরিচয় : কালান্তরে বাংলা গদ্য

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Biswajit Ghosh
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.10
Pages	181-192
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ : ৩৭ সংখ্যা ২

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

বিশ্বজিৎ ঘোষ*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কালান্তরে বাংলা গদ্য।। গোলাম মুরশিদ; আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ-১৩৯৯; মূল্য — পঞ্চাশ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা)।

খুব বেশি দিন নয়, মাত্র এক যুগ পূর্বেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উদ্ভব ঘটে বাংলা গদ্যের। তবে কৈলাশচন্দ্র ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, সুশীলকুমার দে, শিবরতন মিত্র, সজনীকান্ত দাস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল, জহরলাল বসু, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, আবদুল রহীম খোন্দকার, তারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত-গবেষক ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা গদ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের নিজ নিজ রচনায়। কিন্তু এঁরা কেউই উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বকালীন বাংলা গদ্যের বিকাশধারা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি। এঁরা মনে করেছেন, প্রাক্-উনিশ শতকী বাংলা গদ্যের নিদর্শন অনবচ্ছিন্ন নয়, এবং তা মূলত দলিল-দস্তাবেজ-উইল-কর্জপত্রে সীমাবদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের নিদর্শনসমূহ পণ্ডিত-গবেষকবৃন্দ কর্তৃক যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত না-হওয়ার পশ্চাতে দু'টো উল্লেখযোগ্য কারণ সনাক্ত করেছেন আনিসুজ্জামান। তাঁর মতে :

> যে-তত্ত্বজ্ঞান ও যুক্তিবোধ, যে-পরিশীলন ও মননশীলতা থাকলে গদ্যের আবির্ভাব ঘটে, অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্য প্রভাবের আগে আমাদের দেশে তার বিকাশ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন (১৮০০) করে এবং ছাত্রপাঠ্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ-রচনায় উৎসাহ দিয়ে ইংরেজ শাসকেরা যে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, পুরুষ-পরম্পরায় তার অনেক বেশি মূল্য নিরূপিত হয়েছিল। ঐ বিশেষ সময়ের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের বিক্ষিপ্ত উদাহরণকে অবজ্ঞা করবার প্রবণতা তাই স্বাভাবিক ও সাধারণ হয়ে উঠেছিল। [আনিসুজ্জামান ১৯৮৪ : ১৫]।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, পর্যাপ্ত নিদর্শনের অভাব কিংবা নিদর্শন-আবিষ্কারে উদ্যোগ-অনীহা প্রাক্-উনিশ শতকী বাংলা গদ্যের ইতিহাস পুনর্গঠন-প্রয়াসের পথে সৃষ্টি করেছিল গভীর অন্তরায়। অতি-সম্প্রতি কয়েকজন নিষ্ঠাবান এবং কৌতূহলী পণ্ডিত-গবেষকের অপরিসীম প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরোনো বাংলা গদ্য আবিষ্কার ও বিশ্লেষণে সাম্প্রতিক কালে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় *(দুশ' বছরের পুরানো বাংলা গদ্য-পুথি,* কলকাতা, ১৯৭৮); Graham Shaw *(Printing in Calcutta to 1800,* London, 1981); আনিসুজ্জামান *(Factory Correspondence and Other Bengali Documents in the India-Office Library and Records,* London, 1981;

আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, চট্টগ্রাম, ১৯৮২; *পুরোনো বাংলা গদ্য,* ঢাকা, ১৯৮৪); পূর্ণেন্দুনাথ নাথ *(বাংলাভাষায় আইনচর্চার ধারা,* কলকাতা, ১৯৮৪); সুধাংশু তুঙ্গ *(বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা: ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক,* কলকাতা, ১৯৮৫); দেবেশ রায় *(আঠার শতকের বাংলা গদ্য,* কলকাতা, ১৯৮৭); ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় *(বাংলা গদ্যের আদিপর্ব,* কলকাতা, ১৯৮৮) প্রমুখ। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বকালীন বাংলা গদ্যের আবিষ্কার ও বিশ্লেষণের এই ক্ষীণধারায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আর একটি উজ্জ্বল নাম। 'কালান্তরে বাংলা গদ্য' (কলকাতা, ১৯৯২) গ্রন্থের জনয়িতা ডক্টর গোলাম মুরশিদের কথাই আমরা বলছি।

দুই

এ-যাবৎ প্রাপ্ত বাংলা গদ্যের আদিতম নিদর্শন হচ্ছে ১৫৫৫ খিস্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ (রাজত্বকাল ১৫৪০-১৫৮৪) কর্তৃক আহোম-নৃপতি চুকামফাকে (রাজত্বকাল ১৫৫২-১৬০৩) লেখা চিঠি ও তার প্রত্যুত্তর। পরবর্তীকালের যে-সব পুরোনো দলিল-পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে আছে যশোহরের চাঁদ রায়ের সনদ (১৬০৯), মিত্র গাই সাহেব বরাবরেষু রশিদ (১৬১৬), মাহেশের জগন্নাথ দেবের ছাড়পত্র (১৬৪১), জসোমাধব ঠাকুরের দলিল (১৬৭৩), কাছাড়-রাজের অভয়পত্র (১৭৩৬), শ্রীহট্টের দীঘি খননের রশিদ (১৭৪৯), রানী ভবানীর দলিল (১৭৬৭), বর্ধমানের দলিল (১৭৬৭), কোচবিহারের সন্ধিপত্র (১৭৭৩), মেদিনীপুরের জানকী দেবীর দলিল (১৭৭৫) প্রভৃতি। এ-ছাড়া ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিস-সংক্রান্ত দুই সহস্রাধিক চিঠিপত্র, আইনের উনিশটি অনুবাদগ্রন্থ, দুই শতাধিক ব্যক্তিগত পত্র, দুই সহস্রাধিক বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সম্প্রতি পণ্ডিত-গবেষকেরা আবিষ্কার করেছেন। ডক্টর গোলাম মুরশিদ তাঁর *কালান্তরে বাংলা গদ্য* গ্রন্থে প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলায় অনূদিত আইন গ্রন্থ এবং *The Calcutta Gazette* (1784) পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থ অন্তর্গত অধ্যায়গুলোর শিরোনাম উল্লেখ করলেই অনুধাবন করা সম্ভব *কালান্তরে বাংলা গদ্য*-এর উপজীব্য বিষয়। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় : ফোর্ট উইলিয়ম-পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের স্বরূপ,
দ্বিতীয় অধ্যায় : জোনাথান ডানকান ও বাংলা গদ্য,
তৃতীয় অধ্যায় : অপ্রধান অনুবাদকবৃন্দ,
চতুর্থ অধ্যায় : হেনরি পিটস ফরস্টার : সজ্ঞান সংস্কৃতায়নের সূচনা,
পঞ্চম অধ্যায় : বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনের ভাষা,

ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলা গদ্যের রূপান্তর : ঔপনিবেশিক প্রভাবে সংস্কার ও সংস্কৃতায়ন।

উপর্যুক্ত অধ্যায়গুলো ছাড়াও আছে 'সূচনা' এবং 'উপসংহার' অংশ। প্রাক্-উনিশ শতকী বাংলা গদ্য সম্পর্কে ইতঃপূর্বে যে-সব পণ্ডিত-গবেষক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-আলোচনা করেছেন, তাঁদের প্রয়াস 'সূচনা' অংশে মূল্যায়ন করেছেন ডক্টর মুরশিদ। পূর্ববর্তী অনেক গবেষকের গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা থাকলেও, এ-অংশে অনেকের অবদান মূল্যায়ন বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। অথচ এখানে সঙ্গত কারণেই উপস্থিত থাকতে পারতেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, সুধাংশু তুঙ্গ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষক। একাধিক গবেষকের অবদান যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়িত হয়নি, যেমন ঘটেছে প্রফেসর আনিসুজ্জামানের বেলায়। আনিসুজ্জামানের গ্রন্থত্রয় সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো মন্তব্যই করা হয়নি, এবং যা হয়েছে তা-ও প্রশ্নাতীত নয়। বিশেষত তাঁর *Factory Correspondence and Other Bengali Documents in the India-Office Library and Records, আঠার শতকের বাংলা চিঠি* এবং শূন্যপুরাণ, শেক সুভোদয়া, 'স্বরোদয়' ও বৈষ্ণব নিবন্ধসমূহের গদ্যরীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরও মনোযোগ দাবি করতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম-পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের স্বরূপবৈশিষ্ট্য। শব্দব্যবহার, বাক্যসংগঠন এবং শৈলীগত দিক দিয়ে প্রাক্-উনিশ শতকী বাংলা গদ্যের রূপ-রূপান্তর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। এ-অধ্যায়ে ডক্টর মুরশিদের আলোচ্য বিষয় দলিল-দস্তাবেজ-চিঠিপত্র, বৈষ্ণব-ধর্মীয় সাহিত্য, মিশনারিদের রচিত ধর্মগ্রন্থ — বাংলা গদ্যের এ-সব আদি নিদর্শন। এ-সব নিদর্শনের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি যথার্থই বলেছেন :

> এতে লক্ষ্য করা যায় যে, তখন তৎসম শব্দের ব্যবহার ছিলো সীমিত পরিমাণে, অপরপক্ষে আরবি-ফারসী শব্দ, বিশেষ করে সরকারী কাগজপত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। আর বাক্যগুলো ছিলো খাটো দৈর্ঘ্যের এবং সরল প্রকৃতির [গোলাম মুরশিদ ১৯৯২ : ২০]।

পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭) বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে শুরু হয় ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভেই বিভিন্ন কর্জপত্র এবং মামলার কাগজপত্র বাংলায় লেখার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এ-সব দলিলে বাংলা ভাষার উপর

সবেচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে ইংরেজি বাক্য সংগঠনের। এ-প্রক্রিয়া লক্ষ করে অধ্যাপক মুরশিদ মন্তব্য করেছেন : 'ইংরেজির সঙ্গে আদান প্রদানের ফলে বাংলা পদক্রমে .... পরিবর্তন দেখা দেয় এবং বহু অনুবাক্য-সম্বলিত জটিল বাক্য লেখার রীতি প্রচলিত হয় [গোলাম মুরশিদ ১৯৯২ : ৩৪]।

বাংলা গদ্যভাষা বিকাশে জোনাথান ডানকানের (১৭৫৬-১৮১১) অবদান বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। জোনাথান ডানকানই হচ্ছেন বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুদ্রিত গ্রন্থের জনয়িতা। বস্তুত, বাংলা ভাষায় প্রথম চারটি মুদ্রিত গ্রন্থই রচনা করেছেন ডানকান। ১৯৮১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- কাররা জোনাথান ডানকানের নামে মুদ্রিত গ্রন্থগুলোর সংবাদ জানতেন না। তাঁর গ্রন্থসমূহের বিস্তারিত পরিচয় প্রথম উপস্থাপন করেন গ্রাহাম শ' ১৯৮১ সালে। ডক্টর মুরশিদ এ-অধ্যায়ে ডানকান-অনূদিত আইন-বিষয়ক চারটি গ্রন্থের গদ্যরীতি সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে ইতঃপূর্বে কোন বাঙালি দেখেন নি, ডানকানের এমন দুটি গ্রন্থের গদ্যরীতি তিনিই প্রথম বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্য হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত পূর্ণেন্দুনাথ নাথের *বাংলা ভাষায় আইনচর্চার ধারা* শীর্ষক গ্রন্থে ডানকানের চারটি গ্রন্থ সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। অবশ্য পূর্ণেন্দুনাথ দাবি করেন নি যে তিনি স্বচক্ষে ডানকানের সবগুলো গ্রন্থ দেখেছেন।

গোলাম মুরশিদ ডানকানের জীবন, অনূদিত গ্রন্থসমূহের পরিচয়, গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য, অনুবাদের মূল্যায়ন, অনুবাদকর্মে বাঙালি মুন্শিদের প্রভাব — ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দিয়েছেন নানা অজানা তথ্যের সন্ধান। সাময়িকভাবে অন্যান্য গ্রন্থকারের অনুবাদসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যথার্থ কারণেই নির্দেশ করেছেন ডানকানের ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্য। ইতঃপূর্বে ডক্টর আনিসুজ্জামানও জানিয়েছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আইনের অনুবাদ যাঁরা করেছেন, ডানকানের ভাষাই তাঁদের মধ্যে উত্তম। ডানকানের গদ্য জটিলতামুক্ত, নির্মেদ, সরল, সাবলীল। গোলাম মুরশিদের মতে, পাঠযোগ্যতাই হলো ডানকানের ভাষারীতির সবচেয়ে বড় গুণ। পদক্রমের স্বাভাবিকতার কারণে তাঁর গদ্য সহজবোধ্য। আইনের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন অনেক সার্থক পরিভাষা। কিন্তু পরিভাষার চেয়েও ডানকানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো ইংরেজি মূল আইনের খুঁটিনাটি বর্জন করে আসল কথাটা যতদূর সম্ভব সহজ বাংলায় প্রকাশ করা। অনুবাদ শেষ করে সরকারের কাছে তিনি যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে অনুবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন যে দেশীয়দের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করায় তিনি আইনের কোনো কোনো ধারা হয় সম্পূর্ণ

বর্জন করেছেন, নয়তো করেছেন আংশিক পরিবর্তন। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে তাঁর ঔপনিবেশিক স্বার্থচিন্তাও সংগোপনে ছিল সক্রিয়। তাই দেখা যায়, বিচারকদের ঘুষ গ্রহণ এবং তার শাস্তিবিধান-বিষয়ক একটি ধারা তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। কারণ, তাঁর মতে, এই ধারাটি অনুবাদ করলে ইংরেজ বিচারকদের সম্পর্কে দেশীয়দের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেকাংশে লোপ পেত।

ডানকানের গ্রন্থসমূহের গদ্যরীতি বিশ্লেষণ করে ডক্টর মুরশিদ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে, 'সেকালে আইনের অনুবাদ যাঁরা করেছিলেন, ডানকানের ভাষাই তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ [গোলাম মুরশিদ ১৯৯২ : ৬৭]। কিন্তু 'ডানকানের অনুবাদ কে করেছেন'— এমন একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি প্রকাশ করেছেন স্ববিরোধী মন্তব্য। তিনি বলছেন :

> আমার বিশ্বাস, সেকালে অন্য অনুবাদকরা যেমন মুন্‌শিদের দিয়ে আইনের অনুবাদ করিয়েছেন, ডানকানও একই পদ্ধতিতে আলোচ্য বই ও বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনগুলির তরজমা করেছিলেন। তিনি যে বাংলা শিখেছেন অথবা নিজেই অনুবাদ করেছিলেন, জন মিচিকে লেখা চিঠিতে একবারও তা বলেন নি [গোলাম মুরশিদ ১৯৯২ : ৬৭-৬৮]।

যদি তা-ই হয় তাহলে পুরো অধ্যায় জুড়ে ডানকানের গদ্যরীতির প্রশংসা না করে তাঁর নামের আড়ালে অজ্ঞাত মুন্‌শি/মুন্‌শিদের প্রশংসা করাই ছিল সঙ্গত। এ-প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায় যে পুরোনো বাংলা গদ্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেই ডানকানকে প্রকৃত অনুবাদক বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, মুন্‌শিদের কাছ থেকে তিনি হয়তো সামান্য সাহায্য নিয়েছেন মাত্র। এই অভিমতই গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করি। প্রসঙ্গত, ডক্টর অনিসুজ্জামানের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য :

> তিনি নিজেই যে এই অনুবাদ করেছিলেন, তার একাধিক প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ তাঁকে পদাধিকার বলে নয়, ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করা হয় আইনের বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হতে। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গানুবাদে মূলের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে সে-সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন তিনি ; কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিয়ে মূল সংশোধন করেন এবং ডানকানকৃত পরিবর্তন অনুসরণ করতে নির্দেশ দেন ফারসি অনুবাদককে। তৃতীয়তঃ এই কাজে ফারসী অনুবাদকের চেয়ে কম পারিশ্রমিক পাওয়ায় (ডানকানকে ১৫,০০০ টাকা পারিশ্রমিক দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল) ডানকান খুব অসন্তুষ্ট হন এবং এ-বিষয়ে একাধিকবার আবেদন করে বিফল হওয়ায় তাঁর মাতুল, কোম্পানির *ডাইরেক্টর*, জন মিচিকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন [আনিসুজ্জামান ১৯৮৪ : ৩৯]।

জোনাথান ডানকানের পর অপ্রধান অনুবাদকবৃন্দের অবদান বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে। এ-অধ্যায়ের বর্ণিতব্য বিষয় জর্জ চার্লস মেয়ার (১৭৬৭-১৭৯৩), জর্জ ফ্রেডারিক চেরী (১৭৬৬-১৭৯৯), নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন (১৭৬৫-১৮৪১) প্রমুখের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁদের অনূদিত গ্রন্থের গদ্যরীতি। এ-সব অনুবাদকের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচ্য অধ্যায়ের একটি দিক। এদের জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেন নি পূর্ববর্তী গবেষকবৃন্দ। এ-ক্ষেত্রে ডক্টর মুরশিদের অবদান অবশ্য স্বীকার্য।

জর্জ চার্লস মেয়ার-অনূদিত পাঁচটি আইন-গ্রন্থের বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করে ডক্টর মুরশিদ লিখেছেন :

> এতোগুলো বই-এর অনুবাদ করা সত্ত্বেও, মেয়ারের নাম বাঙালি গবেষকদের কাছে এ যাবৎ অজ্ঞাত ছিলো। তার কারণ তাঁর বইগুলোর কোনো কপি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিসহ ভারতবর্ষের কোন গ্রন্থাগারে নেই; অথবা বাঙালি পণ্ডিতগণের বেশির ভাগই যে ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম লাইব্রেরি এবং ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ব্যবহার করেন, সেখানেও নেই। কিন্তু স্কুল অব অরিএন্টাল অ্যান্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজের গ্রন্থগারে 'কালেক্টরগণের আচরণবিধি'র একটি কপি আছে। এই লাইব্রেরিতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের বেশ কয়েকজন পণ্ডিতই গবেষণা করে গেছেন। সুতরাং বইটি কী করে তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, আমার জানা নেই। কিন্তু কারণ যাই হোক, জর্জ মেয়ারের নাম বাংলা গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে এ যাবৎ উল্লিখিত হয়নি [গোলাম মুরশিদ ১৯৯২ : ৭৫]।

অধ্যাপক মুরশিদের এই বক্তব্য মোটেই যথার্থ নয়। ইতঃপূর্বে, ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত, প্রফেসর আনিসুজ্জামানের *পুরোনো বাংলা গদ্য* গ্রন্থের ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় মেয়ারের অনুবাদকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত, ডক্টর পুর্ণেন্দুনাথ নাথের *বাংলাভাষায় আইনচর্চার ধারা* শীর্ষক গ্রন্থের ১৮০-৮১ পৃষ্ঠায় মেয়ার-অনূদিত পাঁচটি গ্রন্থেরই বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সামসময়িক কালের অন্য সব অনুবাদকর্মের সঙ্গে মেয়ারের এই অনুবাদগুলো সম্পর্কে পুর্ণেন্দুনাথ যথার্থই মন্তব্য করেছেন— 'বাংলা গদ্যভাষার গঠন পর্বে এই সব অনুবাদ ও আলোচনার ভূমিকা অসামান্য' [পূর্ণেন্দুনাথ নাথ ১৯৮৪ : ১৮৪]। ডক্টর মুরশিদ, বোধ করি, পুর্ণেন্দুনাথের গ্রন্থটি দেখেন নি। কিন্তু ডক্টর আনিসুজ্জামানের *পুরোনো বাংলা গদ্য* গ্রন্থটি তিনি যে সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করেছেন, এমন প্রমাণ তাঁর গ্রন্থের বহু জায়গায় পাওয়া যায়। তবু কেন এই তথ্যগত বিভ্রান্তি, বুঝতে পারছি না।

তবে তথ্যগত এই বিভ্রান্তি সত্ত্বেও আরো অনেক কথা থেকে যায়। আর সে-কথাগুলো গড়ে ওঠে ডক্টর মুরশিদের পরিশ্রম-প্রযত্ন-প্রয়াসের প্রশংসা-নির্মাণ সূত্রে। কেননা, একথা অনস্বীকার্য তিনিই প্রথম মেয়ার, চেরি, এডমনস্টোন, শৌভেট, বুলার, এলিঅট, স্মিথ, উডফোর্ড, মিলার প্রমুখের অনুবাদকর্মসমূহ গভীর অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের গদ্যরীতির স্বরূপ, নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের ধারায় তাঁদের প্রভাবের মাত্রা। ইতঃপূর্বের অনেক গবেষকই যে-সব গ্রন্থ স্বচক্ষে দেখেন নি, লন্ডনে দীর্ঘকাল প্রবাসজীবন-সূত্রে ডক্টর মুরশিদ তা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে তাঁর আলোচনা অনেক বেশি প্রামাণ্য এ কথা বলাইবাহুল্য।

বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা গদ্যের গঠনযুগে হেনরি পিটস ফরস্টারের (১৭৬১-১৮১৫) অবদানের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। এ-অধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ফরস্টারের এ-যাবৎ অজ্ঞাত জীবনী পুনর্গঠন প্রয়াস। বিভিন্ন উৎস মন্থন করে তিনি ফরস্টারের জীবন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য উদ্ধার করেছেন। এ-ছাড়া ফরস্টারের সজ্ঞান প্রচেষ্টায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃতায়নের যে-প্রয়াস শুরু হয়, সে-সম্পর্কে ডক্টর মুরশিদ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন অলোচ্য অধ্যায়ে। ফরস্টারের গদ্যের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনও এ আধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তবে স্ববিরোধ এবং তথ্যগত বিভ্রান্তি থেকে এ অধ্যায়ও একেবারে মুক্ত নয়। অন্তত দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায় এভাবে —

১. গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে— 'ফরস্টার সত্যি সত্যি ভালো বাংলা জানতেন কিনা, তাঁর লিখিত বাংলার নিশ্চিত কোনো নমুনা না-থাকায়, তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত।' পক্ষান্তরে ১২২ পৃষ্ঠায় দেখি— 'বাংলা ভাষা ছাড়াও হিন্দুস্তানী এবং ফারসি ভাষাতে তাঁর যে যথেষ্ট জ্ঞান এবং দখল ছিলো, এই দুই ভাষায় আইন অনুবাদ করার ঘটনা থেকেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। ... বাংলা এবং সংস্কৃতেই তাঁর দখল ছিলো সবচেয়ে বেশি।

২. ১০৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে— 'এ যাবৎ বলা হয়েছে, ফরস্টার অনূদিত ১৭৯৩ সালের তথাকথিত 'কর্নওয়ালিস কোড' প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ সালে। সেটা যে ঠিক নয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ এ আইনের অনুবাদ শেষ হয়েছিলো ১৭৯৫ সালের এপ্রিলের দিকে। অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছিলো ১৭৯৪ সালের জুন মাসে, আগেই তা উল্লেখ করেছি।' পক্ষান্তরে ১২৩ এবং ১২৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তথ্য থেকে মনে হয়, ফরস্টার 'কর্নওয়ালিস কোড' অনুবাদ করেন ১৭৯৩ সালে। যেমন, ১২৬ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে— 'ফলে ১৭৯৩ সালের ভাষা এবং ১৮০৪ সালের ভাষার মধ্যে অনেকটা

পার্থক্য লক্ষ্য করি।' প্রশ্ন হচ্ছে, ১৭৯৩ সালে অনুবাদকর্ম শুরু না হলে, ১৭৯৩ সালের ভাষা এলো কিভাবে ?

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনের ভাষা। বস্তুত এ-অধ্যায়ে ডক্টর মুরশিদ তার নিজস্ব অবিষ্কার সম্পর্কে যে-ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন বাংলা গদ্যের গঠন-পর্বের ইতিহাস বিনির্মাণের প্রশ্নে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করা যাক :

> ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আগেকার মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা বলতে এ-যাবৎ বোঝাতো কেবল বাংলায় অনূদিত আইনের বইগুলো। মুদ্রিত বাংলা গদ্যের একটা বড়ো উৎসের খবর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা ১৯৮৬ সালের আগে পর্যন্ত জানতেন না। ঐ বছর *সাহিত্য পত্রিকায়* একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি কলেজ-পূর্ববর্তী হাজার দুয়েক বাংলা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনের কথা প্রকাশ করি। এই বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৪ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে [গোলাম মুরশিদ ১৯৯২ : ১৩৫]।

এভাবে *The Calcutta Gazette* পত্রিকায় প্রায় দু'হাজার বাংলা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন অবিষ্কার করে অধ্যাপক মুরশিদ বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সরবরাহ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ-সব বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন থেকে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের বিনিময়-অর্থনীতি কিভাবে বাজার-অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তার পরিচয় পাই। কাজের গদ্য কিভাবে রূপান্তরিত হচ্ছিলো তারও পরিচয় আছে এ-সব বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপনে। ডক্টর মুরশিদ এ-সব প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেছেন— পুরোনো বাংলা গদ্যের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে তাঁর এই আবিষ্কার সঞ্চার করবে নতুন মাত্রা। তবে এখানে একটি তথ্য উল্লেখ করা আবশ্যক। ডক্টর মুরশিদ দাবি করেছেন যে, এ-সব বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন তাঁর পূর্বসূরি গবেষকদের চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এ-দাবি সর্বাংশে সত্য নয়। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত ডক্টর পূর্ণেন্দুনাথের গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উনিশ শতকের পূর্বেই *The Calcutta Gazette* পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক বাংলা বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে গদ্য ভাষা বিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা তিনি আইন অলোচনা-সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন [পূর্ণেন্দুনাথ ১৯৮৪ : ১৩৮-৫৮, ১৮৩-৮৪]। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থেও এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও একটি তথ্য বলা যায় যে কেবল *The Calcutta Gazette* পত্রিকাতেই নয়, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত *The Calcutta Chronicle* পত্রিকায়ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়— 'বাংলা গদ্যের রূপান্তর : ঔপনিবেশিক প্রভাবে সংস্কার ও সংস্কৃতায়ন' প্রসঙ্গ। এ-অ্যায়ে ইংরেজ প্রভাব পড়ার পূর্ববর্তী গদ্যের সঙ্গে ডানকান-মেয়ার-ফরস্টার প্রমুখের গদ্যের তুলনা করে গদ্যভাষার রূপান্তর-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংস্কার এবং সংস্কৃতায়ন বাংলা গদ্যে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে সে-প্রসঙ্গও এখানে আলোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন দৃঢ়মূল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য সরলতা থেকে ক্রম-জটিলতায় রূপান্তরিত হয়, ছোট ছোট বাক্যগুলো লোপ পেয়ে দেখা দেয় দীর্ঘ জটিল বাক্যরাশি। সংস্কৃতায়নের ফলেই এমনটা ঘটেছে বলে ডক্টর মুরশিদ মনে করেন। কিন্তু একই সঙ্গে এ রকম কি ভাবা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তত্ত্বাবধানে ইয়োরোপীয় বাণিজ্য-পুঁজির প্রভাবে বাংলায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে মৌল পরিবর্তন সূচিত হয়, অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো বাংলা গদ্যেও লেগেছিল তার ছোঁয়া। কেননা, আমরা জানি এবং মানি, সমাজের মৌলকাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় উপরিকাঠামো। সাহিত্য কিংবা ভাষা এই উপরিকাঠামোরই একটি উপাদানমাত্র।

সংস্কার, সংস্কৃতায়ন এবং উনিশ শতকীয় সীমাবদ্ধ নবজাগরণের প্রভাবে বাংলা গদ্যে দেখা দেয় যে সদর্থক রূপান্তর, তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে 'উপসংহাব' অংশে। সংস্কার এবং সংস্কৃতায়নের ফলে ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনের দেড়শো বছরের মধ্যেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমানের সাহিত্যিকের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে বলে ডক্টর মুরশিদ মত প্রকাশ করেছেন। সংস্কার ও সজ্ঞান সংস্কৃতায়ন বাংলা গদ্যকে কিভাবে ঐশ্বর্যশালী করেছে এ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইতঃপূর্বে কোন গবেষক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হন নি। কেবল বাংলা ভাষাই নয়, ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে এশিয়া-আফ্রিকা-ইয়োরোপের আরও কতিপয় ভাষায় যে-সদর্থক পরিবর্তন আসে, সে-সম্পর্কে এখানে আছে মূল্যবান আলোচনা। তবে সংস্কৃতায়ন সম্পর্কে লেখকের বিশ্লেষণ ও বক্তব্য সুস্পষ্ট নয় এবং তা স্ববিরোধিতা আক্রান্ত। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সংস্কৃতায়ন বলতে লেখক আরবি-ফারসি শব্দের পরিবর্তে বাংলা গদ্যে তৎসম শব্দের ব্যাপক আগমন-প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এই প্রক্রিয়া বাংলা গদ্যকে করে তুলেছিল কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায় ও উপসংহার অংশে ডক্টর মুরশিদ সংস্কৃতায়ন ব্যাখ্যায় সমাজ-নৃবিজ্ঞানী এম এন শ্রীনিবাসের 'সংস্কৃতিকরণ' প্রত্যয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং বলেছেন যে, সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া বাংলা গদ্যকে করে তুলেছিল বর্ণবহুল ও ঐশ্বর্যময়। সংস্কৃতায়ন

বলতে এখানে তিনি বুঝিয়েছেন বাংলা গদ্যের সংস্কৃত তথা পরিস্রুত হয়ে-ওঠা প্রসঙ্গ। একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের সঙ্গে একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের সমার্থকতা নির্মাণ করে ডক্টর মুরশিদ এখানে মারাত্মক স্ববিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে উপর্যুক্ত সমীক্ষার পর এবার সূত্রাকারে নির্দেশ করা যাক অধ্যাপক মুরশিদের অবদান-প্রসঙ্গ। কিছু তথ্যগত ও তত্ত্বগত অসঙ্গতি ছাপিয়ে ডক্টর মুরশিদের যে-সব অবদান এখানে উদ্ভাসিত, তা শনাক্ত করা যায় এভাবে :

১. বাংলা গদ্যের গঠনযুগে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুবাদ শাখার কর্মচারিরা যে-সব আইন-গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, সেগুলোর বিষয়বস্তু এবং গদ্যরীতি মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে এখানে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্বসূরি গবেষকরা এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু অনেকেই মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন নি।

২. বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ডক্টর মুরশিদই প্রথম কোম্পানির অনুবাদকদের জীবনী পুনর্গঠন করেছেন। ইতঃপূর্বে এঁদের সম্পর্কে এত তথ্য অন্য কোনো গবেষক উদ্ধার করতে পারেন নি।

৩. অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই সহস্রাধিক বাংলা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন আবিষ্কার করে বাংলা গদ্যের গঠনযুগের ইতিহাস রচনায় তিনি সরবরাহ করেছেন তাৎপর্যপূর্ণ নতুন উপাদান।

৪. সংস্কৃতায়ন-প্রবণতা এবং ঔপনিবেশিক-শাসন বাংলা গদ্যের বিকাশে পালন করে যে সুদূরসঞ্চারী ভূমিকা, সে-সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

তিন

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বকালীন বাংলা গদ্যের যে বিপুল পরিমাণ নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে নিশ্চিত করেই এ সিদ্ধান্ত এখন নেয়া যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল বাংলা গদ্যের গৌরবোজ্জ্বল ভিত্তি। এ-কথা যেমন কাজের গদ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি ভাবের গদ্যের বেলায়ও। অতি-সাম্প্রতিককালের এই ধারণাকে আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন ডক্টর গোলাম মুরশিদ। তাঁর *কালান্তরে বাংলা গদ্য* গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রশ্নে নিঃসন্দেহে একটি আকর-গ্রন্থ হিসেবে অনাগত ভবিষ্যতে স্বীকৃতি পাবে। পরিশ্রমসাধ্য এই কাজের জন্য তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তাঁর সযত্ন

প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের আরও অজানা ইতিহাস আবিষ্কৃত হোক, এই আমাদের প্রত্যাশা।।

গ্রন্থপঞ্জী

আনিসুজ্জামান ১৯৮৪ — পুরোনো বাংলা গদ্য। ঢাকা : বাংলা একাডেমী

গোলাম মুরশিদ ১৯৯২ — কালান্তরে বাংলা গদ্য। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স।

পূর্ণেন্দুনাথ নাথ ১৯৮৪ — বাংলাভাষায় আইনচর্চার ধারা। কলকাতা :